ফিজিক্সের গপ্পো

অরুণোদয় সিনহা

কি সম্বন্ধে বই

খুব সম্ভব ক্লাস সিক্স হবে – নতুন বিষয় পেলাম পদার্থবিদ্যা ! নতুন বইয়ের গন্ধ, পাতা উল্টাতেই একটা ছবিতে আটকে গেলাম - মাঝখানে নিউক্লিয়াস, আর তার চারধারে বনবন করে ইলেকট্রন ঘুরে চলেছে। কি গভীর আত্মবিশ্বাসের সাথে বইয়ের পাতায় লেখা ছিলো - এই, এইটাই দিয়ে তৈরি সমগ্র বিশ্ব। কিন্তু এ যে পুরো একটা ছোট সৌরজগৎ - মানে আমাদের দেহের কণায় কণায় আমরা কোটি কোটি সৌরজগৎ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি ?

প্রথাগত ভাবে ফিজিক্স নিয়ে পড়ার সুযোগ হয়নি, বোধহয় ভালোই হয়েছে - সিলেবাসের সীমাবদ্ধতার মধ্যে, পরীক্ষার দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়তে হয়নি, কিন্তু বই পড়ার আনন্দে পড়ে গেছি প্রচুর, আর পড়তে পড়তে কখন যে ঢুকে গেছি উপনিষদের পরিমণ্ডলে, বুঝতেই পারিনি। আজ প্রায় পঁচিশ বছরের সে পাঠ-যাত্রা, তারই দু একটি বিস্ময়ের ভাগ, জানা অজানা অর্ধেক জানা নানা কথা ভাগ করে নিই আপনাদের সাথে - এইটুকুই ভূমিকা। পুরনো সে বইয়ের ছবি আজ আর পাচ্ছি না, ইন্টারনেটের দৌলতে আরো আকর্ষণীয় একটি ছবি দিলাম।
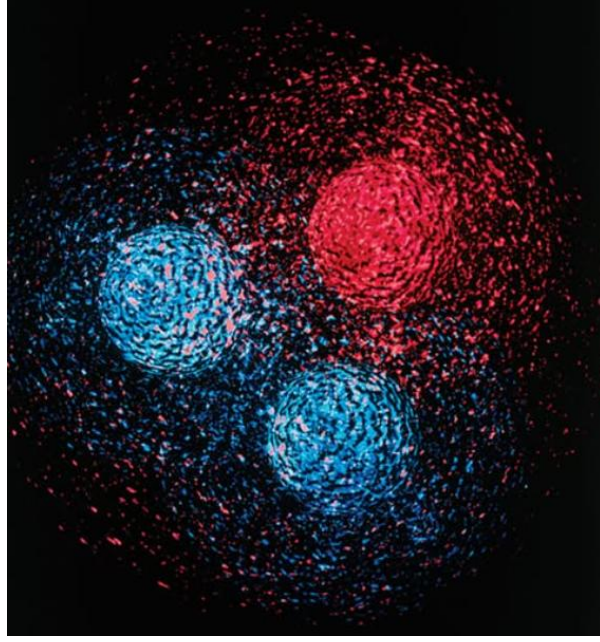
দুনিয়াটা এইসব দিয়েই তৈরী !

ছোট ছোট ফিজিক্সের ঘটনা একদমই সরল আকারে লিখতে চেষ্টা করবো, অঙ্কের অংশ বাদ দিয়ে, যাতে যাঁদের "প্লাস টু-তে সায়েন্স" ছিলো না, তাঁরাও বুঝতে পারেন । ধীরে ধীরে উপনিষদ ও বেদান্তের দৃষ্টিতে ফিজিক্স কোথায় গিয়ে পৌঁছাচ্ছে, সে ব্যাপারে কিছু বলার ইচ্ছে রইলো, দেখা যাক।

বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী নিলস বোহর বলেছিলেন - "কোয়ানটাম ফিজিক্স পড়ে তুমি যদি ভয়ানক ভাবে শক না খাও, তুমি এর কিছুই বোঝোনি !!" এই লেখাগুলি পড়ে আপনারও যদি শক লাগে সেরকম, সেটি কিন্তু আমার দায় নয়, ফিজিক্সের গুণ, কারণ বাসের গায়ে লেখা সেই অমৃতবাণী কে না জানে -

মালের জন্য কোং দাই নহে !!!

নিউটনের আপেল – প্রথম পর্ব

আপেল বাগানে বসে আইজ্যাক নিউটন - কি ভাবছিলেন কে জানে - টুপ করে সামনে পড়লো এক আপেল, আর তাঁর মাথায় প্রশ্ন উঠলো - আপেলটা সোজা পড়লো কেন, এঁকেবেঁকে কেন পড়লো না ? এই নিয়ে তিনি ভাবলেন বহুদিন ধরে, প্রায় কুড়ি বছরের বেশী!!! অবশেষে ১৬৮৭ সালে, আজ্ঞে না, ইংরেজিতে নয়, ল্যাটিন ভাষায় লিখলেন তিন খণ্ডের বই - ফিলোসফিয়া ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া মাথেমাটিকা, শুরু হয়ে গেল পদার্থবিদ্যার এক নতুন যুগ, ধ্রুপদী বলবিদ্যার যুগ - ক্ল্যাসিকাল মেকানিক্সের যুগ।

আমরা যেমন ইতিহাসে জানি প্রস্তর যুগ, তাম্র যুগ, লৌহ যুগ ইত্যাদি, পদার্থবিদ্যায় সেরকম এই ধ্রুপদী বলবিদ্যার যুগ। অবশ্য নিউটন শুধু একা নন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন লিবনিটজ, অয়েলার এবং আরও অনেকে।

কি এমন বললেন নিউটন ? সোজা বাংলায় - তিনটি সূত্র, এবং একটি সুগভীর বিশ্বাস যে, জগৎ-সংসারের সমস্ত রহস্য ওই তিনটি সূত্র দিয়েই ব্যাখ্যা করা যাবে। পরের সংখ্যায় সূত্র এবং সে সম্বন্ধে আরো আলোচনা। এবারে একটা দারুণ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, সিলেবাসের বাইরে জিনিস : ১১৫০ সালে, নিউটনের

প্রায় পাঁচশো বছর আগে, ভারতীয় গণিতবিদ ভাস্করাচার্য রচিত সিদ্ধান্ত-শিরোমণি গ্রন্থের ছয় নম্বর শ্লোকে আমরা এই কথা কয়টি পাই : *মহাশূন্যে অবস্থিত প্রতিটি বস্তুকে পৃথিবী স্বভাবতই নিজের দিকে আকর্ষণ করে, ফলে প্রতিটি বস্তুই পৃথিবীর দিকে পড়ে। এছাড়াও বিভিন্ন গ্রহগুলির মধ্যে পারস্পরিক টানের জন্যেই তারা তাদের নির্দিষ্ট পথে ঘুরে চলেছে।*

আশ্চর্য লাগছে, না ? তবে শুধু এই একটি বই নয়, বরাহমিহির রচিত সূর্যসিদ্ধান্ত, ভাস্করাচার্য রচিত লীলাবতী, প্রশ্নোপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থেও এই আকর্ষণ বল আলাদা আলাদা নামে ব্যাখ্যা করা হয়েছে - গুরুত্বাকর্ষণ শক্তি, ধারণাত্মিকা শক্তি ইত্যাদি নামে। জ্ঞান সত্যিই এক অক্ষুণ্ণ ধারার ঐতিহ্য - দেশ, জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে।
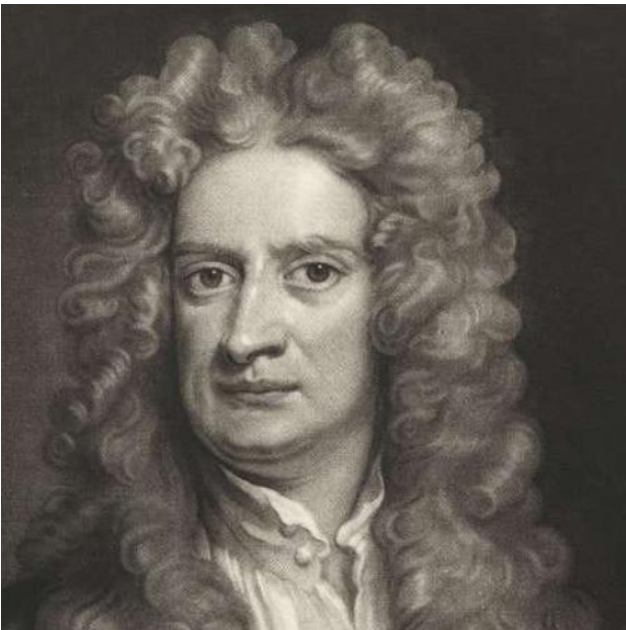
(একটা গোপন খবর)
নিউটনের মাথায় আদৌ কখনো কোন আপেল-টাপেল পড়েনি, ওটা একটা মিথ, মানে গুল্প বা গপ্পো!

নিউটনের আপেল – দ্বিতীয় পর্ব

নিউটন তাঁর সূত্রগুলিতে কি বললেন ? সহজ বাংলায় বললে এরকম দাঁড়ায় : প্রথম, বাইরে থেকে ধাক্কা-ধুক্কি না দিলে যে যেখানে যেরকম অবস্থায় আছে, সে সেখানে সেরকম অবস্থাতেই চিরকাল থাকবে; যে স্থির আছে, সে স্থির থাকবে, যে চলছে সে চলতেই থাকবে। দুই, যত বেশী জোরে ধাক্কা দেওয়া হবে, ততো বেশী জোরে বস্তুর অবস্থারও পরিবর্তন হবে। তিন, সব কাজেরই একটা উল্টো ও একদম সমান পরিমাণ উল্টো কাজ থাকে, অর্থাৎ কিনা - ধাক্কার উত্তরে ধাক্কা, মারের বদলে মার !

- বলছিলাম কি, এর জন্যে নিউটনের দরকার কি .. একবার শিয়ালদার লোকাল ট্রেনে চাপলেই এই সব কটা...

- একদম ঠিক ধরেছেন ! এই জন্যেই নিউটন নিউটন...রেলের গাড়ী থেকে মঙ্গল পাড়ি, হাওড়া সেতু থেকে জোয়ার ভাঁটার হেতু - সওওওব কিছু বোঝা যায়, ব্যাখ্যা করা যায়, এমনকি ভবিষ্যদ্বাণীও করে দেওয়া যায় এই তিনটি আপাত সরল সূত্র দিয়ে !

তাঁর প্রিন্সিপিয়া বইয়ে এই তিনটি সূত্র দিয়ে নিউটন কিসের কিসের ব্যাখ্যা করেছিলেন তার একটা ফর্দ এইরকম :

- একদম শূন্যস্থানে কোন বস্তু কিভাবে চলবে
- গ্রহ নক্ষত্র কিভাবে ঘোরে সে সম্বন্ধে যোহান কেপলারের সূত্রগুলিকে গাণিতিক ভিত্তির ওপরে দাঁড় করানো
- গোল বা বেঁকা রাস্তায় চলতে গেলে তার হিসেব নিকেশ
- জলের চাপের হিসেব নিকেশ
- শব্দের গতিবেগ বার করা
- চাঁদের গতিপথের হিসেব করা
- জোয়ার ভাঁটায় চাঁদ ও সূর্যের প্রভাব কতটা
- সূর্যের বিষুব গতির হিসেব
- বিভিন্ন গ্রহ ও তাদের উপগ্রহগুলির গতিপথের বর্ণনা

চট করে বলতে গেলে, দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিজ্ঞানের যতটুকু ব্যবহার করে থাকি, তার বেশিরভাগটাই নিউটনের এই তিনটি সূত্রের ভিত্তিতে চলে ! কিন্তু, নিউটন শুধু এইটুকু নন, তাঁর আবিষ্কারের তাৎপর্যও এখানেই থেমে ছিলো না, তা পাল্টে দিয়েছিল পরবর্তী তিনশো বছরের জন্যে পৃথিবীর রাজনৈতিক, সামাজিক এমনকি বৈজ্ঞানিক গবেষণার গতিপথও ।
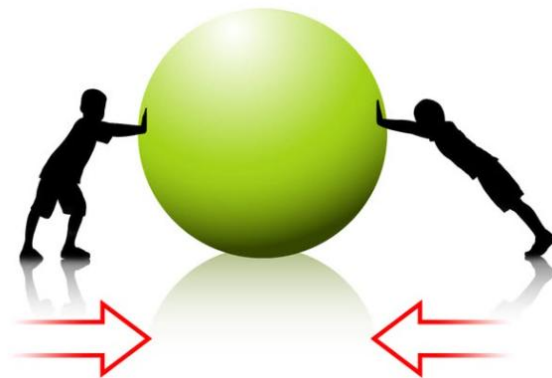
নিউটনের আপেল – দ্বিতীয় পর্ব

বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য "ব্যাখ্যা করা" - আমরা চোখের সামনে যা দেখি - তার ব্যাখ্যা করা। সে কাজে নিউটনের এই তিনটি সরল সূত্র এতো সাংঘাতিকভাবে সফল হলো যে, আক্ষরিক অর্থেই জনমোহিনী বিজ্ঞান, বা পপুলার সায়েন্সের জয়যাত্রা শুরু হলো।

কি এই পপুলার সায়েন্স ? এক দৃঢ় বিশ্বাস যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, বৈজ্ঞানিক সূত্র, এরাই জগতের সবকিছু ব্যাখ্যা করতে পারবে, পারবেই! আমাদের জীবনে, সমাজে, অভিজ্ঞতায় যা কিছু ঘটে, সবকিছু, কেবল ওই তিনটি সূত্র এবং তাদের উপসিদ্ধান্তগুলি দিয়েই ব্যাখ্যা করে ফেলা সম্ভব।

শ্রদ্ধা ভালো, কিন্তু অন্ধবিশ্বাস নয়, আর সে অন্ধবিশ্বাস যখন বিজ্ঞানের মত সদা-পরিবর্তনশীল বিষয়ের কোনো একটি অধ্যায়ের ওপর জন্মায়, তার ফল হয় বেশ ভয়ানক। নিউটনের গতিসূত্র এবং সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার, ধ্রুপদী বলবিদ্যার অব্যর্থতার ওপর সাধারণ মানুষের অগাধ অন্ধবিশ্বাস থেকে এক নতুন মতবাদের জন্ম হলো - নিশ্চয়তাবাদ বা Determinism। ইংল্যান্ডের তৎকালীন সুযোগসন্ধানী রাজতন্ত্র ও চার্চতন্ত্র অতিদ্রুত এই মতবাদকে আত্মসাৎ করে

নিলো, পরবর্তী তিনশো বছরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রসারে তা কিভাবে সহায়ক হয়েছিল, সে আলোচনা ভবিষ্যতের জন্যে তুলে রাখি। এই নিশ্চয়তাবাদের অপফলের একটিমাত্র ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে ফিরে যাবো আমাদের মূল আলোচনায়, ফিজিক্সের পরবর্তী আবিষ্কার গুলিতে।

গোঁড়া অ্যাঙ্গলিকান খ্রীষ্টান বংশে জন্মানো নিউটন ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষিত ছিলেন, আজীবন বিবাহ করেননি, চার্চের ভাষায় বলা হয় সেলিব্যাসি। যে সময়ে তিনি মাধ্যাকর্ষণ নিয়ে বই লিখছেন, একই সময়ে ইংল্যান্ডে চার্চের বিস্তার ও তার ইতিহাস নিয়ে তিনি এক গভীর গবেষণায়ও রত। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে নিউটনের যা বৌদ্ধিক ধারণা, মূর্তিপূজায় ভরপুর তৎকালীন খ্রিস্টধর্মের ধারণার তা সম্পূর্ণ উল্টোদিকে - শুরু হলো তাঁর বিপদ !

নিজের ঈশ্বরচিন্তার কথা, ধর্মের ভাবনার কথা, আধ্যাত্মিকতার কথা সারাজীবন তাঁকে গুপ্ত রেখে যেতে হয়েছে রাজা ও চার্চে ভয়ে, প্রাণদণ্ড যার শাস্তি ! অতিঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধুর সাথে গোপন পত্রালাপেই তাঁর সে ভাবনার হদিশ আমরা পাই।

২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৬৯৩ সালে রিচার্ড বেন্টলেকে তিনি চিঠিতে লিখছেন - *..এইটি ধারণা করা অত্যন্ত অসম্ভব যে এই জড়, প্রাণহীন বস্তুগুলো (জড় নয় এমন কিছু আলাদা মাধ্যমের*

সক্রিয় সাহায্য ছাড়া) একে অপরের ওপর কাজ করে, একে অপরকে প্রভাবিত করে।

অতি সাবধানে, সবদিক বাঁচিয়ে, প্রিন্সিপিয়া বইয়ের তৃতীয় খন্ডে তিনি শুধু এইটুকু লিখে যেতে পেরেছিলেন : *সূর্য, গ্রহ, ধূমকেতুর এই অসাধারণ সিস্টেম - এইটি একজন "বুদ্ধিমান ও সর্বশক্তিমান অস্তিত্বের" অভিভাবকত্ব ও প্রভুত্বেই হতে পারে। এই বুদ্ধিমান ও সর্বশক্তিমান অস্তিত্ব সমস্ত কিছু পরিচালনা করেন, জগতের আত্মারূপে নয়, বরং প্রভুরূপে; এবং তাঁর প্রভুত্বের ভিত্তিতে তাঁকে "রাজা ঈশ্বর" বা "মহাজাগতিক শাসক" বলা ভুল, বরং সেই পরম প্রভু কেবল এক অস্তিত্ব যিনি শাশ্বত, অসীম এবং সম্পূর্ণভাবে পরিপূর্ণ।*

তাঁর জন্মের বহু হাজার বছর আগে রচিত তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লী নিউটন পড়েছিলেন কি না জানা নেই, কিন্তু ইতিহাস আমাদের এই দেখায় - সর্বযুগে, সর্বকালে গভীরভাবে যাঁরা চিন্তা করবেন তাঁরা সবসময় একই উপলব্ধিতে পৌঁছবেন। ঈশ্বর কি ? তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলছেন - "সত্যম, জ্ঞানম, অনন্তম ব্রহ্ম:" - জগতের যিনি কারণ, উপাদান তিনি শাশ্বত, অন্তহীন, শুদ্ধ জ্ঞানমাত্র।

এখন ভাবলে হতাশ লাগে, যদি পারতেন নিউটন খোলাখুলি, মুক্ত ভাবে তাঁর এই চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে; চৈতন্যের ধারণাকে ফিজিক্সের মধ্যে গেঁথে দেওয়ার জন্যে আমাদের বোধহয় আরো চারশো বছর অপেক্ষা করতে হতো না ! পপুলার সায়েন্স, রাজনীতি ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বশে বিজ্ঞানের অগ্রগতি পিছিয়ে গেছিলো শত শত বছর সেদিন।
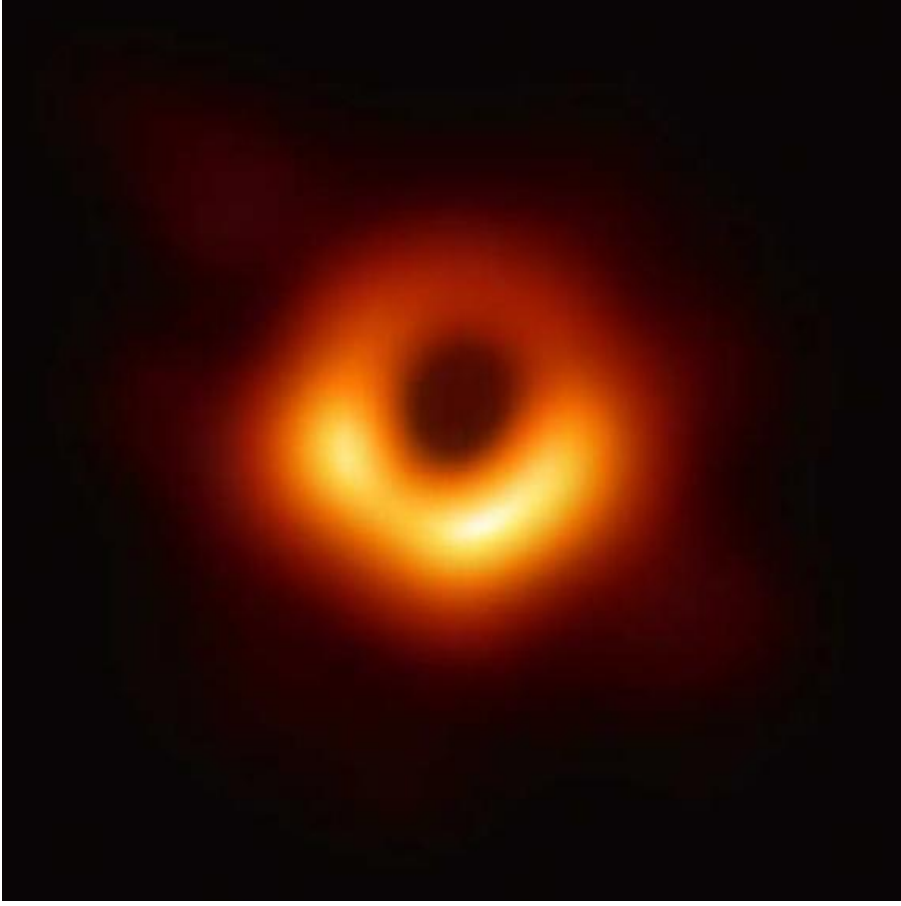
ভাসা ভাসা ইলেকট্রনের ফটো !

নিউটনের আপেল – তৃতীয় পর্ব

নিউটনের সমসাময়িক আরো কিছু আবিস্কার এই সময়ে উল্লেখের দাবী রাখে। ১৬০০ সালে উইলিয়াম গিলবার্ট, যিনি রাণী প্রথম এলিজাবেথের চিকিৎসক ছিলেন, একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন - পৃথিবী নিজেই একটি বিশাল চুম্বকের মতো ব্যবহার করে, এর নির্দিষ্ট উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু আছে, ঠিক যেমন যেকোনো ছোট চুম্বকের থাকে। বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েল গ্যাসের আচরণের সূত্রগুলি আবিষ্কার করলেন, আধুনিক রসায়নের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলো। ১৬৫০ সালে জার্মান বিজ্ঞানী অটো ভন গুয়েরিকে বানিয়ে ফেললেন প্রথম ভ্যাকুয়াম পাম্প। ১৬৯৭ সালে থমাস স্যাভেরী বানিয়ে ফেললেন প্রথম ইঞ্জিন, তা ব্যবহার হতেও শুরু করলো ঘোড়ার গাড়ির পরিবর্তে।

পরের শতকে একের পর এক বিজ্ঞানী - ভল্টা, বার্নৌলি, ল্যাভয়শিয়ের, ক্যাভেন্ডিশ, কুলম্ব, ফুরিয়ের বিজ্ঞানের পরিধিকে এতো দিকে ছড়িয়ে দিলেন যে ফিজিক্সের মধ্যেই একাধিক বিষয় তৈরি হয়ে গেলো। বল বা ফোর্স এবং বস্তুর ওপরে তার প্রভাব নিয়ে কথা বলে ফিজিক্সের যে অধ্যায়, তার

নাম হলো মেকানিক্স। বিদ্যুৎশক্তির প্রকৃতি, কিভাবে তা উৎপাদন, সঞ্চয়, সরবরাহ, ব্যবহার করা যেতে পারে - তা নিয়ে তৈরি হলো ইলেক্ট্রিসিটি চ্যাপ্টার, আর চৌম্বক-শক্তির প্রকৃতি, ব্যবহার নিয়ে ম্যাগনেটিসম। আলোর গতিপ্রকৃতি, কাঁচের মধ্যে আলোর ব্যবহার নিয়ে তৈরি হলো অপটিক্স, আর শব্দের জন্যে অ্যাকউষ্টিকস। তরল পদার্থের চালচলন নিয়ে ফ্লুইড মেকানিক্স, আর ব্রহ্মাণ্ডের গ্রহ নক্ষত্র ধূমকেতুর চালচলন বোঝার জন্যে আস্ট্রোফিজিক্স।

আরো ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো - প্রতিটি ক্ষেত্রেই যেমন যেমন নতুন তত্ত্ব খুঁজে পাওয়া গেল, প্রতিভাবান লোকেরা সেই তত্ত্বের ভিত্তিতে অগণন যন্ত্র বানাতে শুরু করে দিলেন - শুরু হল টেকনোলজির যুগ ! সায়েন্স আর শুধু সায়েন্স রইলো না, হয়ে গেলো সায়েন্স ও টেকনোলজি।

বিজ্ঞানের কথা শুনলে এবার থেকে লোকে প্রশ্ন করতে শুরু করলো - এতে আমার লাভ কি ? আমার কোন পরিশ্রম এতে লাঘব হবে ? যুদ্ধে, দেশ শাসনে, দেশ দখলে, বাণিজ্যে, ব্যবসায় আমার কি সুবিধা হবে ?

নিউটন ভাগ্যবান ছিলেন, এই উৎপাত তাঁকে সহ্য করতে হয়নি।

নিউটনের আপেল – চতুর্থ পর্ব

আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করেছিলাম নিউটনকে দিয়ে, যাঁর সময়কাল ১৬৬০ সালের পরে। কৌতূহল জাগতে পারে যে তার আগে কি তাহলে বিজ্ঞানের কোন আবিষ্কারই হয়নি ? তা কিন্তু আদৌ নয়।

ভারতবর্ষ, চিন, গ্রীস, মিশর, সুমেরু, মিশর, অসুর, ইরান - প্রতিটি প্রাচীন সভ্যতাই বিজ্ঞান ও টেকনোলজি দুই ক্ষেত্রেই অভাবনীয় উন্নতি প্রদর্শন করেছিল। বর্তমান যুগের মাথা-গোলানো ফিজিক্সে প্রবেশের আগে প্রাচীনযুগের কৃতিত্ব গুলির এক ছোটখাটো উল্লেখ মন্দ হয় না।

প্রায় ৩৫০০ হাজার বছর প্রাচীন ইরানীয়রা আবিষ্কার করেছিলেন বায়ু চালিত পাম্প, মাটির জল তুলে কৃষিকাজে ব্যবহার হতো তা। সপ্তম শতকে ইরানী কারিগরেরা এই পাম্পের উন্নতি সাধন করেন যা পার্সিয়ান পাম্প নামে আজও পরিচিত। দ্বাদশ শতকে গণিতজ্ঞ মুহাম্মদ ইবন মুসা আল খাওয়ার্জমি আবিষ্কার করেন লগারিদম টেবিল, গণিতের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সহায়।

অসুর সভ্যতার লোকেরা আবার যুদ্ধাস্ত্র টেকনোলজিতে তাদের মনোনিবেশ করেছিলেন। এছাড়াও সেরামিক পদ্ধতি, বন্যা প্রতিরোধক দেওয়াল তৈরিতে তাঁরা পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন।

মিশরীয় সভ্যতার পিরামিড, স্ফিংস, মমি টেকনোলজি তো জগদ্বিখ্যাত - আলাদা করে বলার কিছু নাই। সুমেরীয় সভ্যতার লোকেরা ধাতু নিষ্কাশনের পদ্ধতি অত্যন্ত ভালোভাবে রপ্ত করেছিলেন; এছাড়াও সময় পরিমাপের বর্তমান সেকেন্ড-মিনিটের পদ্ধতি সুমেরীয় সভ্যতার অবদান।

চৈনিক সভ্যতার অবদান কাগজ, পর্সেলিন, রেডার যন্ত্র, সিল্ক, অ্যাবাকাস, কম্পাস, বারুদ, ছায়া ঘড়ি, ব্লাস্ট ফার্নেস, গরম হাওয়ার বেলুন, ভূকম্প-নির্দেশক যন্ত্র এবং ছাপাখানা। ৩৪০০ বছর আগে দশমিক সংখ্যা ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। পঞ্চম শতাব্দীতে গণিতবিদ ঝু চোংঝি পাই (π) সংখ্যার মান দশমিকের সাত ঘর পর্যন্ত হিসাব করেছিলেন।

গ্রীসের বৈজ্ঞানিক ভাবধারা সর্বাধিক প্রচারিত, কারণ পরবর্তীকালে এই ভাবধারার ওপর ভিত্তি করেই ইউরোপীয়ান বিজ্ঞান গড়ে ওঠে। তাঁরা গণিতের বিভিন্ন শাখার প্রভূত উন্নতিসাধন করেছিলেন - ত্রিকোণমিতি, পাটিগণিত, সংখ্যাতত্ত্ব

ও জ্যামিতি। ইউক্লিড বর্ণিত জ্যামিতি আজকের দুনিয়াতেও সর্বত্র পাঠ্য। অন্যান্য অবদানের সাথে সাথে গ্রীসের অবদান জলচালিত শস্য-পেশাই মেশিন, অ্যালার্ম ঘড়ি, শীতের দিনে মেজে গরম করার উপায়, ক্রেন, আর আর্কিমিডিস স্ক্রু যার সাহায্যে জল পাহাড়ের উপরে তোলা যেত।

ভারতবর্ষের ইতিহাস খুঁজলে পাই সাড়ে আট হাজার বছর আগে উন্নত সেচ ব্যবস্থা, সূর্যঘড়ি, সমুদ্রবিজ্ঞান ও জাহাজ নির্মাণ পদ্ধতির জ্ঞান, বিভিন্ন পরিমাপ পদ্ধতির স্ট্যান্ডার্ড তৈরি, নিখুঁত ক্যালেন্ডার তৈরি, সংখ্যাতত্ত্ব দ্বারা অকল্পনীয় বড়ো সংখ্যা গঠন ও তাদের ব্যবহার, আলোর গতি পরিমাপ, পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্যের দূরত্ব পরিমাপ, পৃথিবীর পরিধি ও ব্যাস পরিমাপ।

সাড়ে তিন হাজার বছর আগে সেরামিক পদ্ধতির জন্যে ফার্নেস ব্যবহৃত হতো। এছাড়াও মেহরৌলির গরুড় স্তম্ভ, অজস্র মন্দিরের স্থাপত্য, আলোর খেলা,শব্দের খেলা, জ্যামিতির সুনিপুণ ব্যবহার ভারতীয় সভ্যতার বিজ্ঞান কুশলতার পরিচয় দেয়।

গ্রীক সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বৌদ্ধিক যোগাযোগ ছিল, এবং গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত তত্ত্বগুলো

ভারতীয় ও গ্রীসের ক্ষেত্রে একই, যা পরবর্তীকালে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু এহ বাহ্য, বিশুদ্ধ পদার্থবিদ্যা বা ফিজিক্সের কথা যদি ধরা যায়, ভারতীয় মননে এমন এক বিষয়ের উদ্ভব হয়েছিল, যার হদিশ সমসাময়িক সভ্যতাগুলি তো পায়ই নি, আজকের দিনে দাঁড়িয়েও আমরা সে পর্যায়ে পৌঁছতে হিমশিম খাচ্ছি। তা টেকনোলজি নয়, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, কাজেই *এ প্রশ্নের উত্তর জেনে আমার লাভ কি*, প্রশ্ন অবান্তর।

প্রশ্ন অতি সোজা - জগৎটি তৈরি কি দিয়ে ? উত্তর ?

জগতের উপাদান কি

পদার্থবিদ্যার দুটি প্রধান প্রশ্ন; এক, জগতের উপাদান কি, জগৎ তৈরি কি দিয়ে; দুই, জগৎ তৈরী হলো কিভাবে, পদ্ধতিটি কি।

প্রাচীনকালে, এই জগৎ-উপাদান সম্বন্ধিত বিজ্ঞান এবং দর্শন – এই দুই বিষয়দুটিকে আলাদা করে দেখা হতো না। যাঁরা বৈজ্ঞানিক, তাঁরা দর্শনের বিভিন্ন তত্ত্বের প্রবক্তাও বটে। তাই, বিজ্ঞানের এই বিভাগটির আলোচনায় বার বার দর্শনের প্রসঙ্গ এসেই যায়।

প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে ভারত ও গ্রীস এই ব্যাপারে অত্যন্ত গভীর চিন্তা ভাবনা করেছিল, এবং দুই চিন্তার গতিপ্রকৃতির ও প্রচুর মিল ছিল।

একটি কোনো অতি সূক্ষ্ম বস্তু দ্বারা এই বিশ্বজগৎ নির্মিত, সে বস্তুকে আর ভাঙা যায় না, সে বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সীমার বাইরে, অর্থাৎ কিনা খালি চোখে সে বস্তুকে দেখা যায় না - এই সিদ্ধান্তগুলো দুটি সভ্যতাই মানতো।

ভারতবর্ষে সে মূল বস্তুর এক নাম - আত্মা, আর আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস ও লিউসিপ্পাস শর বস্তুর নাম দেন - আতোমোস (ইংরেজিতে Atomos)। গ্রীক

সভ্যতা পরবর্তীকালে ইউরোপীয়ান বিজ্ঞানকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, পরবর্তীকালে এই "আতোমোস" শব্দ থেকেই "অ্যাটম" শব্দটি তৈরি হয়, যা আজও আমরা ব্যবহার করি।

ডেমোক্রিটাস এই আতোমোস-কে বর্ণনা করেছেন প্রকৃতির "মূল উপাদান এক কণা" হিসাবে, যাকে আর ভাঙা যায় না। তোমস (গ্রীক ভাষায় লেখা হয় τόμος) শব্দের অর্থ - কাটা, ভাঙা, ছেদন ইত্যাদি। তার আগে "আ"-যোগে কিনা - অকাট্য, অচ্ছেদ্য ইত্যাদি। ডেমোক্রিটাসের মতে - জগতের যেকোন বস্তুকে যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তারা শেষমেশ ওই আতোমোসে এসে পৌঁছবে, সবকিছুই আসলে আতোমোস দিয়েই তৈরী।

ভারতে দুটি দর্শন - সাংখ্য আর বৈশেষিক - জগতের এই উপাদান বিচারে আরো গভীরে গবেষণা করেছিল। ঋষি কপিল সাংখ্যদর্শনের প্রবক্তা, পরবর্তীকালে বাচস্পতি মিশ্র, বিজ্ঞানভিক্ষু ও প্রশস্তপাদ এই দর্শনের উজ্জ্বল নক্ষত্র। বৈশেষিক দর্শনের প্রবক্তা ঋষি কণাদ, পরবর্তীকালে উদয়ন, জয়ন্ত ভট্ট, উদ্যত কর এই দর্শনকে সমৃদ্ধ করেন।

গ্রীক দর্শন, ফলস্বরূপ পরবর্তী ইউরোপীয় বিজ্ঞান, এবং ভারতীয় দর্শনের মধ্যে এক বিশাল পার্থক্য - ভারতবর্ষ তার গবেষণার মধ্যে চৈতন্যকে প্রথম থেকেই অন্তর্গত করে নিয়েছিল।

শুধুমাত্র জড় জগৎ নয়, বরং জড় ও চেতন জগতের একসাথে বিশ্লেষণ এখানে করা হতো, আজকের দিনে বলতে গেলে - ফিজিক্স ও বায়োলোজির এক কম্বিনেশন।

দ্বিতীয়ত, জড় পদার্থ যে আসলে শক্তিরই এক রূপ - এ আবিষ্কারও বহু প্রাচীন, কতো তা বলা মুশকিল। যদিও গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল "এনেরজিয়া" বলে একটি শব্দ তৈরি করেছিলেন - যা কিছু কাজ করে তা বোঝাতে - কিন্তু এই ধারণাগুলি কখনোই ভারতীয় ধারণার সমান গভীরতা লাভ করেনি। এই দুটি খেয়াল রাখলে, ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বোঝা একটু সহজ হয়।

সাংখ্যদর্শনের মতে এই জগৎ দুটি প্রাথমিক উপাদান - পুরুষ ও প্রকৃতি (এই শব্দগুলির অর্থ আজকে আমরা যা জানি, তার সঙ্গে মেলাবেন না দয়া করে!) দ্বারা তৈরী। পুরুষ হচ্ছে বিশুদ্ধ চৈতন্য, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সীমার অতীত - আর প্রকৃতি সমস্ত প্রকার জড় পদার্থ, শক্তির মূল ভিত্তি, কিন্তু অচৈতন্য। এই পুরুষ আর

প্রকৃতির সংমিশ্রণে এই জগৎ তৈরী হয়। কিভাবে সে কাজ হয়, এবং কোথায় কোথায় বর্তমান যুগের বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলির সাথে তার আশ্চর্য মিল পাওয়া সে সম্বন্ধে পরে আমরা বিস্তারিত বলবো।

বৈশেষিক দর্শন মতে জগৎ বিশেষ বিশেষ কিছু জিনিস দিয়ে তৈরী - এই জিনিসগুলি শাশ্বত, অর্থাৎ কিনা কখনো নষ্ট হয় না। তারা কি ? আকাশ, শূন্যস্থান, সময়, আত্মা, চার প্রকারের মানসিক যন্ত্র - মন, চিত্ত, বুদ্ধি, অহংকার এবং চার প্রকারের "পরমাণু" - মাটি, জল, আগুন ও বাতাস। এদের বিভিন্ন সংমিশ্রণে তৈরী এই জগৎ।

এই মতের সাথে গ্রীক মতের কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, যাঁদের মত ছিল যে, জগতের মূল উপাদান চারটি - মাটি, জল, আগুন ও বাতাস। পরবর্তীকালে অ্যারিস্টটল এদের সাথে "ইথার" বলে পঞ্চম আরেকটি উপাদান যোগ করেন।

এবারে আমরা ঝাঁপ দেবো সোজা দুহাজার বছর, পৌঁছে যাবো ১৬৬১ সালের ইংল্যান্ডে, নিউটনের যুগ প্রায় শুরু হওয়ার অপেক্ষায়। বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েল ওই বছর প্রকাশ করলেন তাঁর বই "দি স্কেপটিক্যাল ক্যাইমীস্ট", চারিদিকে পড়ে গেল বিশাল হইচই !!

অ্যালকেমির গপ্পো

রবার্ট বয়েলের বই কেন হইচই ফেলে দিয়েছিল, তা বোঝার আগে এক দুর্দান্ত রহস্যের গল্প শোনা দরকার - অ্যালকেমির গল্প !

৩৩২ খ্রীষ্টপূর্ব - আলেকজান্ডার আক্রমণ করলেন মিশর। কিন্তু মিশরের কারিগরী কুশলতার নিদর্শন দেখে, মমি তৈরীর পদ্ধতি, পিরামিড, স্ফিংস - গ্রীকদের চোখ কপালে উঠে গেল! মিশরীয়দের এই প্রেততত্ত্ব, পুনর্জন্মতত্ত্ব তাদের অভিভূত, ভীত করে তুললো তো বটেই, কিন্তু এইসবের সঙ্গে গ্রীকদের প্রকৃতি তত্ত্ব - সব কিছুই মাত্র চারটে উপাদানে তৈরি : আগুন, মাটি, জল আর হাওয়া - মিলে মিশে তৈরী হলো অদ্ভুত এক বিদ্যা - কিমিয়া বিদ্যা, যার উদ্দেশ্য - কৃত্রিমভাবে সোনা তৈরীর পদ্ধতি খোঁজা, আর, মানুষের অমরত্বের সন্ধান লাভ !

যুক্তি খুব সহজ। প্রকৃতির সব কিছুই যখন চারটি মাত্র উপাদানে তৈরী, তাহলে সোনা যে উপাদানে তৈরী, বাকি সব কিছুই সেই একই উপাদানে তৈরী, পার্থক্য কেবল মেশানোর অনুপাতে। তাহলে সেই মেশানোর অনুপাতগুলো যদি পরিবর্তন করা যায়, বালি, সিসা, তামাকে সোনায় পরিবর্তন করা যাবে না কেন ?

এর সঙ্গে মিশরীয়রা যোগ করলেন পরশপাথরের ধারণা, ইংরেজিতে ফিলোসফার স্টোন, যা ছোঁয়ালেই সোনা !!

এই ধারণাগুলোকে আজকের দিনে হাস্যকর, আজগুবী মনে হলেও সুদীর্ঘ দু হাজার বছর ধরে এইই ছিল পাশ্চাত্য বিজ্ঞান - আর এর ফলে মানুষ কতরকমের পরীক্ষা যে করে ফেলেছিল তার ইয়ত্তা নেই। ডাইনি বিদ্যা, সকল রকমের ম্যাজিক, ভুডুইজম এইসব যেমন মিশেছিল এই খোঁজার প্রচেষ্টায়, তেমনই এই কিমিয়া বিদ্যার ফলেই পাশ্চাত্য জগৎ সন্ধান পেলো বিভিন্ন মৌল পদার্থের, বার করে ফেললো বিভিন্ন সংকর পদার্থ বা অ্যামালগাম, সংকর ধাতু বা অ্যালয়।

পরবর্তীকালে আরব জাতি যখন মিশর দখল করে, তারা এই কিমিয়া বিদ্যার নতুন নাম দেয় - অ্যালকেমি, যা থেকেই আজকের দিনের পরিচিত শব্দগুলির - কেমিস্ট্রি, কেমিক্যাল - উদ্ভব।

সোনার হরিণের পেছনে ছোটার এই স্বপ্নে ছেদ পড়লো অবশেষে রবার্ট বয়েলের হাতে। দুহাজার বছর ধরে চলা মানুষের এই প্রচেষ্টাকে এক ধাক্কায় ভেঙে দিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন গ্রীকদের চার-উপাদান মতবাদ সম্পূর্ণ ভুল, কারণ - মাটি, আগুন, জল আর বাতাস মিশিয়ে অন্য কোনো জিনিস

বানানোও যায় না, এবং কোনো জিনিস থেকে ওই চারটি উপাদান কোনোভাবে বারও করা যায় না। তিনি এর পরিবর্তে ধারণা দিলেন মৌলিক পদার্থের, হাতেনাতে পরীক্ষা করে দেখালেন জলের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে তারা হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন নামের দুটি গ্যাসে ভেঙে যায়, ওই গ্যাসগুলোকে কিন্তু আর কোনোভাবেই আর ভাঙা যায় না - তাই হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মৌলিক পদার্থ, জল যৌগিক পদার্থ।

কিন্তু প্রকৃতিতে এইরূপ মৌলিক পদার্থ কয়টি ? বয়েলের সময় তার সম্পূর্ণ তালিকা জানা ছিল না, তিনি জানতেন কেবল সোনা, রূপো, লোহা, তামা, সিসা, ফসফরাস, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এইমাত্র। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা জানি ১১৯টি এইরকম মৌলিক পদার্থ আছে, তবে এগুলির বিশ্লেষণ, ব্যবহার, প্রয়োগ আজকের দিনে পুরোপুরিভাবে কেমিস্ট্রি জগতের অন্তর্ভুক্ত।

রবার্ট বয়েল কেমিস্ট্রির স্রষ্টা, তাঁর একটি অনবদ্য আবিষ্কার গ্যাস সম্বন্ধিত, "বয়েলের সূত্র" নামে সুপরিচিত। ব্যাপারটি খুব সহজে এইরকম - চারদিক থেকে বন্ধ একটি পাত্রে কোনো গ্যাসকে আটকে, তাপমাত্রা স্থির রেখে, যদি তার ওপর চাপ বাড়ানো যায়, তাহলে সে গ্যাসের আয়তন ধীরে ধীরে কমতে

থাকবে, আবার চাপ কমালে আয়তন বাড়তে থাকবে। ইনজেকশনের সিরিঞ্জ, প্রেসার কুকার - এই দুটি এই সূত্রের উপর ভিত্তি করে কাজ করে।

আমরা আবার ফিরে আসি ফিজিক্সে - বিশ্ব রহস্যের সন্ধানে, বয়েলের যুগ থেকে আরো একশো বছর পরে, ল্যাভয়সিয়ের, প্রাউষ্ট আর জন ডাল্টনের যুগে।

ইনি রবার্ট বয়েল, আদতে ইনিও কিন্তু একজন অ্যালকেমিষ্টই ছিলেন অর্থাৎ সোনা বানানোর চেষ্টাই করতেন !

অ্যালকেমি থেকে ফিজিক্সের যুগ

১৮০৩ সালে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক জন ডাল্টন তাঁর "পরমাণু তত্ত্ব" সামনে নিয়ে এলেন। তাঁর তত্ত্বের বক্তব্যের সাথে বহুপুরানো গ্রীসের অ্যাটম তত্ত্বের খুব বেশী পার্থক্য ছিল না, পার্থক্য ছিল সে বক্তব্য নির্ণয়ের পদ্ধতিতে। ডেমোক্রিটাস বা বাকি গ্রীক দার্শনিকগণ তাঁদের সিদ্ধান্তগুলো ঠিক কিভাবে খুঁজে বার করেছিলেন, কোন পরীক্ষার মাধ্যমে, সে ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু লিখে যাননি।

ডাল্টন লিখেছিলেন, সব পরীক্ষার সব স্টেপ, বিস্তারিতভাবে - তা সে সফল হোক বা অসফল। এই লেখালেখির উপকারিতা কি ? ভবিষ্যতে যে কেউ ওই লেখা ফলো করে ওই পরীক্ষা নিজে করতে পারবেন, একই ফলও পাবেন - এইটিই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। জন ডাল্টন বললেন :

১) সমস্ত পদার্থ অ্যাটম দিয়ে তৈরী, এগুলি অবিভাজ্য এবং এদের ধ্বংস করা যায় না।
২) কোনো মৌলিক পদার্থের সবকয়টি অ্যাটম একদম একরকমের হয় - আকার ও ভরের দিক থেকে। আবার আলাদা আলাদা মৌলিকগুলির অ্যাটম আলাদা আলাদা রকমের হয়।

৩) যৌগিক পদার্থ গুলি তৈরী হয় বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের অ্যাটম জুড়ে জুড়ে।
৪) কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া যখন ঘটে, তখন অ্যাটমগুলির ওই সাজানোর বিন্যাসটা খালি পাল্টে যায়, অ্যাটমের কোনো পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ, কয়লা পুড়িয়ে ধোঁয়া আর ছাই তৈরি হলো - এটি একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া - এই প্রক্রিয়ার আগে, কয়লার মধ্যে যতগুলো অ্যাটম ছিল, ধোঁয়া আর ছাইয়ের মধ্যে ততগুলোই অ্যাটম থাকবে - খালি অ্যাটম গুলো কয়লার মধ্যে যেভাবে সাজানো থাকে, ধোঁয়া আর ছাইয়ের মধ্যে অন্যভাবে সাজানো থাকে - ব্যাস এইটুকুই মাত্র পরিবর্তন।

জন ডাল্টন অবশ্য নির্ভর করেছিলেন তাঁর পূর্ববর্তী দুজন বৈজ্ঞানিকের কাজের উপরে - ১৭৮৯ সালে অন্তোয়ানে ল্যাভয়শিয়ার, আবিষ্কার করেছিলেন "ভরের সংরক্ষণ সূত্র"। এতে তিনি প্রমাণ করলেন - কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শুরুতে উপাদানগুলোর যা মোট ভর থাকে, বিক্রিয়ার শেষে যা যা তৈরি হয়, তাদের মোট ভরও একই থাকে। কয়লা পোড়ানোর আগে তার মোট যা ভর, ধোঁয়া আর ছাইয়ের মোট ভরও একই।

১৭৯৯ সালে জোসেফ লুই প্রাউষ্ট বর্ণনা করলেন নির্দিষ্ট অনুপাত সূত্র, কোনো যৌগিক পদার্থের মধ্যে মৌলিক পদার্থগুলো সবসময় একই অনুপাতে থাকে। জল এক যৌগিক

পদার্থ, দুটি মৌলিক পদার্থ - হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন - যথাক্রমে ২ ভাগ আর ১ ভাগ নিয়ে তৈরী। এই মহাবিশ্বে যেখানেই জল পাওয়া যাক না কেন, তা সবসময়েই ওই ২ ভাগ হাইড্রোজেন আর ১ ভাগ অক্সিজেন নিয়েই তৈরি হবে, হবেই !

কিন্তু, ল্যাভয়শিয়ার বা প্রাউষ্ট - কেউই অ্যাটম বা পরমাণুর ধারণা আনেননি; যেটা জন ডালটনের কৃতিত্ব। ডাল্টন এও বলেছিলেন, অ্যাটমকে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা আর ভাঙা যায় না।

পরবর্তী একশো বছরের মধ্যেই এই তত্ত্ব অর্ধেক ভুল প্রমাণিত হয়েছিল - অ্যাটমকে ভাঙা গেছিলো, কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা নয় !

বোস আইনস্টাইন কনডেনসেট

পয়লা জানুয়ারী তাঁর জন্মদিন পেরিয়ে যায় সকলের অগোচরে! পিকনিকের ফাঁকে ইতিউতি ফেসবুকে নজর পড়ে বটে - হায়রে, ইনিও নোবেল পেতে পারতেন, অঙ্কে একশোয় একশো দশ, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে রেকর্ড নম্বর এখনো তাঁর, বাঙালির গর্ব - ... কিন্তু গর্বটা কিসের জন্যে ? একগাদা নম্বর পাওয়া, এসরাজ বাজানো আর আইনস্টাইনকে একখানা পেপার পাঠানো ছাড়া, ড: সত্যেন্দ্রনাথ বসু করেছিলেনটা কি ?

- এই মুশকিল করলেন! অতো অঙ্ক, ফিজিক্স যে বুঝি না...

- একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক। আচ্ছা বলুন তো, পদার্থের কয়টি অবস্থা ?

- এটা সোজা প্রশ্ন! কঠিন, তরল, গ্যাস।

- এইখানেই আক্ষেপ, জানেন - ছোটবেলা থেকে ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত ঐটাই পড়ে আসছি, শেখাচ্ছি। কিন্তু বাঙালি হয়ে অন্ততঃ বাংলার ছেলেপুলেগুলোকে কি এইটুকু শেখানো যায় না বলুন - পদার্থের ছয়টা অবস্থা, আর তার মধ্যে একটা গোটা অবস্থা আমাদেরই ঘরের লোক, সত্যেন বসুর আবিষ্কার ?

- সে আবার কি মশাই ? পদার্থের ছয় অবস্থা মানে ?

- আজ্ঞে হ্যাঁ, পদার্থ ছয় রকম অবস্থায় থাকতে পারে - কঠিন, তরল, গ্যাস, প্লাজমা, বোস আইনস্টাইন কনডেনসেট (BEC) আর ফার্মিওনিক কনডেনসেট। (একখানা ছবি জুড়েছি, দেখুন)

আজকে আমরা সরল ভাষায় একটু বোঝার চেষ্টা করি এই BEC সম্বন্ধে; আর যাই হোক - এ আমাদেরই ঘরের লোকের আবিষ্কার।

জগতে আমরা কঠিন, তরল, গ্যাস - এই তিন রকমের জিনিস খুব সহজেই দেখতে পাই। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায় - আসলে এইগুলো একই পদার্থের আলাদা আলাদা অবস্থা।

একটা পদার্থের মধ্যে কতটা তাপ আছে, এবং সেই তাপের ঠেলায় পদার্থের মধ্যে পরমাণুগুলো কতো জোরে দৌড়াদৌড়ি করছে - সেটাই ঠিক করে দেয় পদার্থটি কঠিন থাকবে, তরল হবে, নাকি গ্যাস।

আমরা দেখি, জল তরল পদার্থ। মানে কি না, ঘরের টেম্পারেচার যা, তাতে জলের মধ্যে পরমাণুগুলো বেশ আরামসে নেচে-কুঁদে বেড়াচ্ছে। এইবারে, দিলাম জলকে ফ্রিজে ঢুকিয়ে - ব্যাস! জলের ভেতরে যত তাপ ছিল, আস্তে আস্তে সব বেরিয়ে গেল, পরমাণুদের নৃত্যও বন্ধ ! তারা সব

আঁটোসাঁটো হয়ে বসে পড়লো - জল আর তরল রইলো না, হয়েগেল কঠিন - বরফ !!

উল্টোটা যদি করি ? জলকে দিলাম ফুটিয়ে, আর তার মধ্যে তাপ হু হু করে বাড়তে লাগলো, আর পরমাণুগুলো ? তাদের নাচ এতো বাড়তে লাগলো, যে নাচতে নাচতে তারা একে অপরকে টা টা বাই বাই জানিয়ে ছড়িয়ে পড়লো, - আমরা বলি - জলের বাষ্প, বা গ্যাস অবস্থা।

এইসব দেখেশুনে একটা নিয়ম আমরা বলতে পারি - পদার্থের অবস্থা কি হবে, তা নির্ভর করে সেই পদার্থের পরমাণুগুলোর মধ্যে কতো পরিমাণ শক্তি আছে, তার ওপর।

এইবার এক মজা - পদার্থকে যদি ঠাণ্ডা করতে থাকি, করতেই থাকি, অদ্ভুত সব জিনিস দেখা যায়। কতো ঠাণ্ডা ? সে ভয়ানক অকল্পনীয় ঠাণ্ডা - মাইনাস ২৭৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস, বা তার ধারেকাছে !! রাশিয়ার ভস্তকে একবার মাইনাস ৮৯ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল - মানুষের জ্ঞানত: সেটাই সব চেয়ে কম প্রাকৃতিক ঠাণ্ডা - এমনকি দক্ষিণ মেরুতেও গড়ে তাপমাত্রা মাইনাস ষাট ডিগ্রীর নিচে কমই যায়, - সেখানে আমরা বলছি কতো ? মাইনাস ২৭৩ ডিগ্রী !!

তো, এই তাপমাত্রায় যদি কোন পদার্থকে নিয়ে যাওয়া যায়, তার পরমাণুগুলির সমস্ত কম্পন, নৃত্য, চলন - থেমে যায়, স্তব্ধ, একেবারে, একদম। আর, তখন পদার্থ আর কণারূপে থাকে না - তারা হয়েযায় - তরঙ্গ, ওয়েভ!! এক একটি পরমাণু, এক একটি তরঙ্গ।

তারপর ? তারপর সব তরঙ্গ একসাথে মিলে গিয়ে একটাই অখণ্ড তরঙ্গ..অসীম, অনন্ত।

আবার, ধীরে ধীরে যদি সে তরঙ্গকে গরম করা হয়, তা পরমাণুর রূপ ধারণ করে, তারপর পদার্থের।

ড: বসু শুধু অঙ্কের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, শুধু তাই নয় - এই কনডেনসেট অবস্থায় পদার্থ কি কি রকম ব্যবহার করবে, তারও সম্পূর্ণ বর্ণনা দিয়েছিলেন। তাঁর সে আবিষ্কারে সিলমোহর পড়েছিল স্বয়ং আইনস্টাইনের, তিনি সেই পেপারটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশনার ব্যবস্থাও করেছিলেন।

১৯৯৫ সালে বিজ্ঞানীরা প্রথম এই অবস্থাটি পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হন। এই লিঙ্কে ক্লিক করলে দেখা যাবে একটি ছোট্ট ভিডিও; এটি একটি অ্যানিমেশন অবশ্যই, কিন্তু এটি দেখলে খানিক ধারণা হতে পারে BEC ঠিক কি রকম।

পথের শেষ কোথায় – প্রথম পর্ব

আজ ভাবলে অবাক লাগে যে মাত্র ১৮০ বছর আগেও সায়েন্টিস্ট (Scientist) শব্দের অস্তিত্বই ছিল না ! খানিক বিতর্ক থাকলেও মোটামুটিভাবে এইটি স্বীকৃত যে ১৮৩৪ সালে কেমব্রিজের ঐতিহাসিক-অধ্যাপক উইলিয়াম হুইওয়েল এই শব্দটির ব্যবহার শুরু করেন।

এখন প্রশ্ন, তার আগে তাহলে বিজ্ঞানচর্চাকারীদের কি বলা হতো ? দার্শনিক, ফিলোসফার!

আজ্ঞে হ্যাঁ, আজকের দিনে আমরা এই দুটি বিষয়কে যতোই আলাদাভাবে দেখি না কেন, দর্শন ও বিজ্ঞান কিন্তু আসলে একই বিষয়কে দুটি ভিন্ন দিক থেকে দেখার প্রচেষ্টা।

কোনো কিছুর সম্বন্ধে "কেন" - এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজে দর্শন, আর "কী ভাবে" - এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় বিজ্ঞানের কাছে। ব্যাপারটা কিরকম ? ধরুন, এই জগতের সৃষ্টি। ঠিক কী ভাবে পরমাণুগুলো পর পর সাজিয়ে, কার সাথে কে কি বিক্রিয়া করে, কবে এই জগৎ গড়ে উঠেছে - বিজ্ঞান খোঁজে এইটা। আর, দর্শন উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে - কেন এই জগৎ গড়ে উঠলো, কার কি উদ্দেশ্যের জন্য - এই জাতীয় প্রশ্নের।

আজকের ফিজিক্স বা পদার্থবিদ্যা ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে বিংশ শতাব্দীর গোড়া হতে ফিজিক্সের যে অভাবনীয় অগ্রগতি হয়েছে তার খানিক খোঁজ নেওয়া দরকার।

১৯২০ সালের আশেপাশে, ফিজিক্স তার প্রায় তিনশো বছরের ঘুম ভেঙে আবার যেন জেগে উঠলো - নিউটনের সময় হতে "মেকানোমর্ফিক" বা যন্ত্রের মতো নিখুঁতভাবে চলা মহাবিশ্বের স্বপ্ন তার অবশেষে ভাঙলো।

স্থূল, বা চোখে দেখা যায়, বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা হয় ম্যাক্রোকসমিক (Macrocosmic) - এমন সকলের ফিজিক্স বর্ণনায় আবির্ভূত হলেন আইনস্টাইন, তাঁর রিলেটিভিটি তত্ত্ব নিয়ে। আর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তু, যেগুলি চোখে দেখা যায় না, বিজ্ঞানের ভাষায় মাইক্রোকসমিক (Microcosmic) - এগুলির ব্যাখ্যা দিতে এলেন ওয়ার্নার হাইসেনবার্গ, তাঁর আনসার্টেন্টি প্রিন্সিপল নিয়ে।

বিজ্ঞানের বক্তব্যগুলোও কিরকম যেন আজগুবি ধরনের হয়ে উঠল, যেমন কিনা – এক একজনের কাছে সময় এক একরকম গতিতে চলে; যে যত বেশি জোরে ছুটবে তার ঘড়ি তত আস্তে চলবে; শূন্যস্থানও দুমড়ে মুচড়ে যেতে পারে; বাস্তবে কি ঘটবে

সেটা নির্ভর করে যে দেখছে তার ওপরে; জড়বস্তু আর শক্তি - ও দুটো একই জিনিস, এরকম আরো কতো কি !

কবিদের কাব্য-কল্পনার সীমানা ছাড়িয়ে ছুটলো বৈজ্ঞানিকদের থট-এক্সপেরিমেন্ট বা মানসিক পরীক্ষার রথ।

ম্যাক্রোকসমিক দিকে, ১৯৮৩ সালের শুরুর সময় থেকে বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের উৎপত্তির ঠিক পরেই (মানে, ১ সেকেন্ডের কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ সময়ে) ঠিক কি কি ঘটেছিল তার এক মডেলও বানাতে শুরু করে দিয়েছেন। ব্ল্যাক-হোল আর হোয়াইট-হোল এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রধান নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

আবার মাইক্রোকসমিক জগতে, গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাসের অ্যাটোমস, বা অবিভাজ্য কণা, আজ ভেঙে চুরমার ! প্রায় দুশোর বেশী উপপারমাণবিক কণা বা, সাব-অ্যাটমিক পার্টিকল নিয়ে এক অত্যন্ত জটিল ব্রহ্মাণ্ডের চিত্র ধীরে ধীরে উঠে এসেছে - যাদের "কণা" আদৌ বলা যায় কি না, সে ব্যাপারে পদার্থবিজ্ঞানীরাই সন্দিহান!

তাঁদের মতে এই কণাগুলিকে "উপপারমাণবিক জগতের এক একটি ঘটনা", বা ইভেন্ট (Event) বলা বেশী যুক্তিযুক্ত; পদার্থবিজ্ঞানী ফ্রিতজফ কাপরার ভাষায় আবার কণা হলো

সদানৃত্যশীল শক্তির এক সুসংবদ্ধ উপস্থাপনা। নটরাজের কথা মনে পড়ছে কি ?

এই কণা-ঘটনাগুলির বেশিরভাগের জীবনই অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী - কয়েকটি তো ২-৩ পার্টিকল সেকেন্ডের বেশী থাকেই না (১ পার্টিকল সেকেন্ড মানে ১ সেকেন্ডের ১০০ কোটি কোটি কোটি ভাগের ১ ভাগ)।
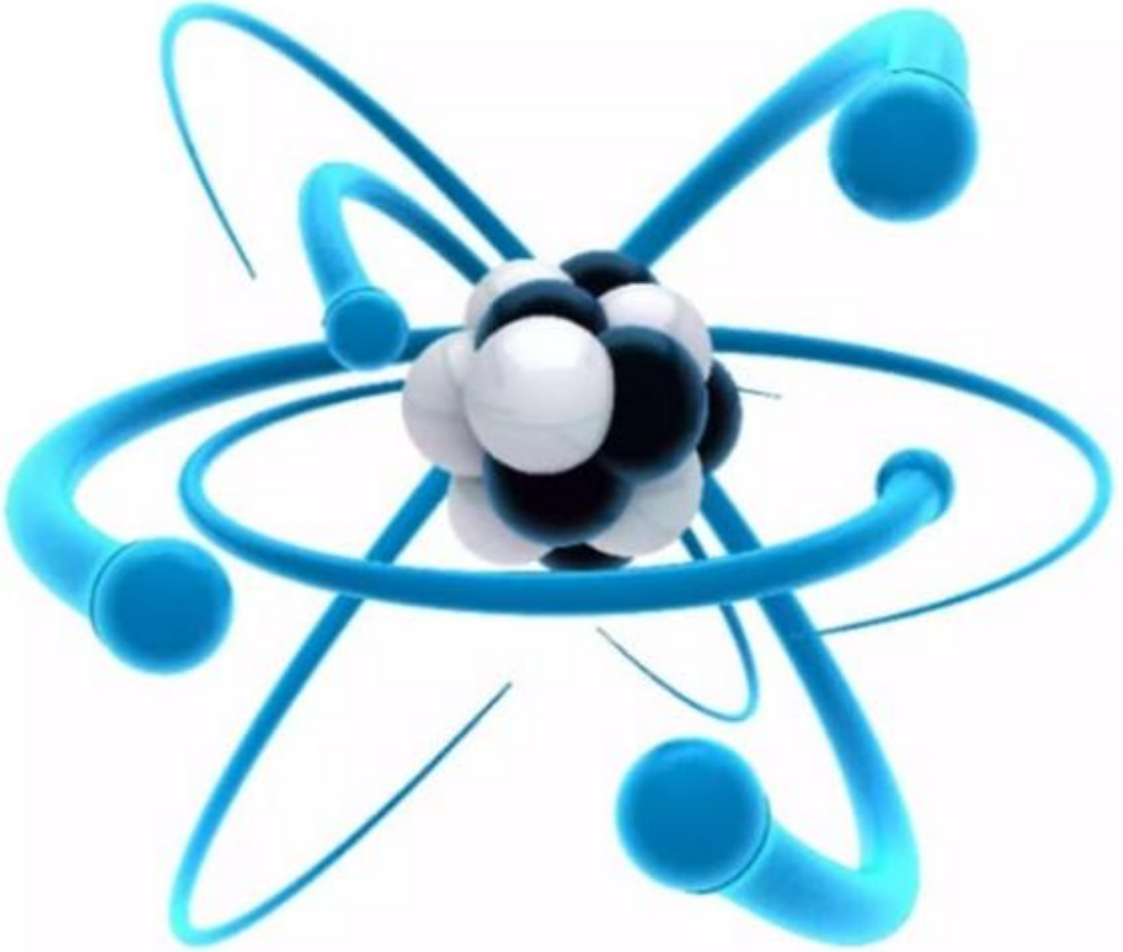
পথের শেষ কোথায় - পর্ব ২

বিজ্ঞানের এক বড়ো সমস্যা - জীবনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা; কে জীব, কে জড়, আবার জড়পদার্থ থেকে জীবন কিভাবে তৈরী হয়, এক বান্ডিল প্রোটন নিউট্রন ঠিক কিভাবে দানা বেঁধে উঠলে মানুষ তৈরী হয়, যে কিনা আবার কল্পনা করে ছবি আঁকতে পারে, কবিতা লিখতে পারে - এ এক বড়ো রহস্য!

বলতে পারেন, এর সাথে ফিজিক্সের সম্পর্ক কি ? ফিজিক্স তো জড়পদার্থের জগৎ নিয়ে নাড়াঘাঁটা করে, জীব-জড়ের সমস্যা তো জীববিজ্ঞানের মধ্যে পড়ে।

বাস্তব হলো যে, জড়পদার্থ নিয়ে নাড়াঘাঁটা ফিজিক্স আগে "করতো"; বর্তমানের ফিজিক্স কিন্তু জড় পদার্থের সঙ্গে সঙ্গে চেতনা, মন ও তাদের সাথে জড় পদার্থের সম্পর্ক নিয়েও সমান গুরুত্ব দিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে।

১৯২৬ সালে জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী ম্যাক্স বর্নের প্রবাবিলিটি ওয়েভ তত্ত্বের ভিত্তিতে একটি অদ্ভুত, নতুন ধারণা ধীরে ধীরে উঠে আসতে থাকে - আলোক কণা ফোটন এবং ইলেকট্রনেরা হয়তো বা সচেতন, বা জৈব। পরবর্তীকালে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার কোপেনহেগেন ইন্টারপ্রিটেশন এবং এভারেট-

হুইলার ইন্টারপ্রিটেশন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিতে শুরু করে যে এই মহাবিশ্ব বোধহয় আমাদের মনের দ্বারা সৃষ্ট।

বিশ্বজগৎ ধীরে ধীরে একটি অমনিজেক্টিভ ইউনিভার্স বা দ্রষ্টা-দৃশ্য সমন্বিত জগৎ রূপে ফুটে উঠতে থাকে, যে জগতে একজন বিজ্ঞানী আর কেবলমাত্র একজন বিচ্ছিন্ন, দূরবর্তী পর্যবেক্ষক নন, বরং যে পরীক্ষা, এক্সপেরিমেন্ট তিনি করছেন তার এক অবিচ্ছেদ্য, অঙ্গাঙ্গী অংশ।

বর্তমান ফিজিক্স ধীরে ধীরে প্রাচ্য অধ্যাত্মবিদ্যার আঙিনায় পা রাখতে শুরু করেছে। যে শূন্যস্থান আইনস্টাইনের চোখে বক্র বলে ধরা দিয়েছিল, আজকের দিনে বিজ্ঞানী জন হুইলার তাঁর দ্য কসমিক কোড বইয়ে তাকেই বর্ণনা করছেন চরমতম ঘটনাবহুল ফিজিক্সের আধার হিসেবে।

পাশ্চাত্য মনে এই নতুন ফিজিক্সের প্রভাব সম্বন্ধে আমেরিকান প্রাবন্ধিক মাইকেল ট্যালবট লিখছেন : *বাস্তবতা বা রিয়ালিটির এই অমনিজেক্টিভ ধারণা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে কিভাবে পরিবর্তন করে তা দেখতে হবে। কেবল এইটুকু বলা যায়, যাই পরিবর্তন হোক না কেন, তার মাত্রা হবে অকল্পনীয়...*

১৯৮২ সালে প্রকাশিত তাঁর দ্য কসমিক কোড বইয়ে রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানী হেইনজস প্যাগেলস

লিখে ফেলেছেন : *ফিজিক্সের জগতে একটি যুগান্তকারী বিপ্লবের মুখোমুখি আমরা, যা প্রায় কোপারনিকাসের বিপ্লবের সমতুল্য - এই শতকের প্রথম দশকে রিলেটিভিটি এবং কোয়ান্টাম মেকানিক্সের আবিষ্কারের মাধ্যমে যার সূত্রপাত...*

এই মহাবিশ্বের সম্বন্ধে আমরা যতো বেশী জানছি, আমাদের জ্ঞানভান্ডার যতো বেশী ভরে উঠছে, ততোই নতুন নতুন সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর প্রশ্ন উঠে আসছে; বিজ্ঞানীরা তাঁদের পরীক্ষাগারে কি দেখছেন বা আবিষ্কার করছেন সেগুলো সাধারণ, দৈনন্দিন জীবনের ভাষায় প্রকাশ করাও ততোই মুশকিল হয়ে উঠছে।

আইনস্টাইনের ভাষায়, অব-পারমাণবিক জগৎ যেন একটা কখনোই খোলা যাবে না এরকম একটা ঘড়ি, যার ডায়ালে কাঁটাগুলি যে ঘুরছে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কি করে যে ঘুরছে তা কিছুই বুঝতে পারছি না!

নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় বিখ্যাত বিজ্ঞানী জন হুইলার জানাচ্ছেন : *(জগৎ সম্বন্ধে) আমরা যতো বিশদে জানছি, সামগ্রিকভাবে (জগতের) পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞানতা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে।*

হেইনজস প্যাগেলসের ভাষায় : *অধীত বিষয়বস্তুর প্রকৃতি কিরকম, এই দিক দিয়ে বিচার করলে বিজ্ঞান অত্যন্ত বিমূর্ত হয়ে উঠেছে। মহাবিশ্বের মূলসূত্রটি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। দৃশ্যমান জগৎ যে অদৃশ্য দ্বারা পরিচালিত, এই ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে উঠছে।*

কিন্তু ১৯৭০-এর দশকের শুরু হতে ফিজিক্স ধীরে ধীরে একটি অত্যন্ত সরল, কিন্তু সুগভীর এক গন্তব্যের দিকে যাত্রা শুরু করেছে; আজকের অধিকাংশ তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানীর স্বপ্ন সেই গন্তব্য, যা গত সহস্র বছরের দার্শনিক এবং সাধকদেরও স্বপ্ন, - ইংরেজিতে যাকে বলা হচ্ছে গ্র্যান্ড ইউনিফিকেশন থিওরি, সরল বাংলায় একের তত্ত্ব।

এই একীকরণ কেবল ভর ও শক্তির একীকরণ নয়, কেবল বিভিন্ন মহাজাগতিক শক্তির একীকরণ নয়, তার থেকে আরো গভীর - বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রথমবার মন ও জড়, বিষয় এবং বিষয়ী, বিজ্ঞানী এবং পরীক্ষার একীকরণ।

জন হুইলার বলছেন : *আমরা সাধারণভাবে ভাবি দুনিয়াটা বড়ো আশ্চর্য, কিন্তু আসল আশ্চর্য যদি কেউ থাকে - সে হলাম আমরা। আমার মনে হয় (সেই রহস্যের) অন্তর্নিহিত বার্তাটি আমরা এখনো পড়ে উঠিনি, কিন্তু আগামীদিনে নিশ্চিতভাবেই কোনো একটি অতি সরল বাক্যে সে সত্য উচ্চারিত হবে।*

ভুল মাপ, বড়ো চাপ !!!

১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে, ৩৩ কোটি ডলার খরচ করে নাসা মঙ্গলযান পাঠিয়েছিল, মঙ্গলের আবহাওয়ার হালচাল জানার জন্য। প্রায় দশ মাস ছুটে চলার পর, ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বরে সেই মঙ্গলযান যেই মঙ্গলের কক্ষপথে ঢুকতে গেলো, অমনি...ভুম ফটাস ! যোগাযোগের লিংক হারিয়ে গেল, আর তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

পরবর্তীকালে এক অনুসন্ধানী রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছিল খুব সম্ভবতঃ ভুল উচ্চতায় মঙ্গলের কক্ষপথে প্রবেশ করায় সে ধ্বংস হতে গেছিল। তার প্রবেশ করার কথা ছিল মঙ্গলপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৪০ মাইল উচ্চতায়, কিন্তু সে নেমে যায় প্রায় ৩৫ মাইল উচ্চতায় এবং তারপর কক্ষে প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু এরকম ভুল হলো কেন ? এতো ভুল নির্দেশ গেল কি করে ?

মঙ্গলযানের মধ্যে যে সফটওয়্যার ছিল, সে সমস্ত গণনা করছিল পুরনো এককে (FPS সিস্টেমে বলের একক পাউন্ড-ফোর্স) আর পৃথিবী থেকে যে সফটওয়্যারটি নির্দেশ পাঠাচ্ছিল, সে ব্যবহার করছিল আধুনিক একক (SI সিস্টেমে নিউটন) !

এক পাউন্ড-ফোর্স প্রায় ৪.৪৫ নিউটনের সমান। কাজেই, ভুল হলে মাপ, বড়ো চাপ !!!

জগতের আসল রূপ – প্রথম পর্ব

জগতে এতো ফাঁকা জায়গা -
তবু আমরা ভিড়ের ঠেলায় অস্থির !

না, কোনো আধুনিক কবির কবিতা নয়, এটাই ফিজিক্সের মধ্যে দিয়ে বলা জগতের প্রকৃত রূপ !

ধরুন, একখানা স্টিলের গ্লাস হাতে নিলুম - ওর মধ্যে অন্ততঃ ১০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০০ এর বেশী অণু আছে, তারও বেশী আছে পরমাণু। কি ভিড়, কি ভিড় !! নড়াচড়া করার জায়গা অব্দি নেই - অষ্টমীর প্যান্ডেলমুখী জনস্রোত কোথায় লাগে !!!

কিন্তু, প্রতিটা পরমাণুর মধ্যে ? পরমাণুর মধ্যেও কি ওইরকম ভিড় ? আদৌ নয়। পরমাণুর মধ্যে ফাঁকা, পুরো ফাঁকা, আদিগন্তবিস্তৃত ফাঁকা, কিচ্ছু নেই।

কতোটা ফাঁকা ? একটা ফুটবল স্টেডিয়ামে মাঠের মাঝখানে একটা যদি একটা ফুটবল রাখা থাকে, আর বাকি স্টেডিয়াম যদি পুরোটা ফাঁকা থাকে, ততোটা ফাঁকা।

পরমাণু স্টেডিয়াম হলে ওই ফুটবলটা হলো নিউক্লিয়াস (যার মধ্যে প্রোটন আর নিউট্রন থাকে), বাকি পুরোটাই ফাঁকা।

এইবার এই শক্ত অঙ্কটা কষা যাক - এতগুলো ফাঁকা জায়গা (মানে পরমাণু) যদি পাশাপাশি বসে, তাহলে সব মিলিয়ে তো ফাঁকাই হওয়ার কথা - তাহলে স্টিলের গেলাসটা এতো শক্ত হলো কি করে ?

ফাঁকা পাশাপাশি বসে ভিড় কিভাবে হয়, ফাঁকাই তো হওয়া উচিৎ ?

বাস্তবজ্ঞান বলে - হওয়াই উচিত। অনেকগুলো ফাঁকা জায়গা পাশাপাশি বসে কখনো একটা শক্ত জিনিস গড়ে তুলতে পারে না। আবার সেই বাস্তব জ্ঞানেই দেখছি - ফাঁকা পরমাণু জুড়ে জুড়ে তৈরী গেলাস ভয়ঙ্কর কঠিন, শক্ত।

এই জন্যেই কি ঋত্বিক ঘটকের সেই বিখ্যাত উক্তি : ভাবো, ভাবো, ভাবা প্র্যাক্টিস করো!

জগতের আসল রূপ – দ্বিতীয় পর্ব

পরমাণুর মধ্যে পুরো জায়গাটা যদি ফাঁকাই হবে তাহলে সেই ফাঁকা ফাঁকা পরমাণু জুড়ে কঠিন পদার্থ হয় কি করে ?

আগের পর্বে এই প্রশ্ন উঠেছিল। ব্যাপারটা শুনতে আজগুবি লাগলেও, সমাধান খুব একটা কঠিন নয়।

কারণ - ইলেকট্রন, এক সুপার-রানার !

দেখতে এই ইলেকট্রন পুচকি-পানা (ব্যাসার্ধ হলো ১ সেমির ১০০ কোটি ভাগের এক ভাগের কাছাকাছি) হলে কি হবে, দৌড়ায় সে ভয়ঙ্কর স্পিডে - সেকেন্ডে প্রায় ২১৮৮ কিলোমিটার।

সে কতো স্পিড ? ১৮ সেকেন্ডে গোটা পৃথিবীকে একবার চক্কর দিয়ে দেওয়ার মতো।

একে তো পরমাণুর মধ্যে ওইটুকু জায়গা - ১ সেন্টিমিটারের ১ কোটি ভাগের এক ভাগের কাছাকাছি - আর তার মধ্যে ওই ইলেকট্রন-বীর সেই তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে।

আর, তারই ফলে অবাক করা এক কাণ্ড ঘটছে !

সেই কাণ্ড বোঝার জন্যে আরেকটা তুলনা দিই।

সিলিং ফ্যান যখন বোঁ-বোঁ করে ঘোরে, তখন কিরকম আকার দেখি বলুন তো ? মনে হয় না একটা গোল চক্র, একটা গোল থালা ঘুরছে ? কিন্তু ফ্যানে তো আছে তিনটে মাত্র লম্বা ব্লেড, তাহলে গোল মনে হয় কেন ?

কারণ আমাদের চোখের দোষ। এতো তাড়াতাড়ি ব্লেডগুলো ঘোরে যে, আগের ব্লেড আমাদের দৃষ্টির সীমার বাইরে যেতে না যেতেই পরের ব্লেডটা এসে পড়ে, আর আমাদের চোখ সিগনাল পাঠায় - নাহ্, আলাদা আলাদা ব্লেড নেই, একটাই গোল চাকতি ঘুরছে।

ইলেকট্রনের ব্যাপারটিও খানিক ওই ফ্যানের মতো, তবে ফ্যান কিনা ঘুরছে একটা সমতলে (চাকতির মতো) আর ইলেকট্রন দৌড়ে বেড়ায় একটা ফুটবলের মতো ত্রিমাত্রিক জায়গায়।

সঙ্গের ছবি দেখলে হয়তো ব্যাপারটি খানিক পরিষ্কার হবে। এইটা একটা পরমাণুর কল্পিত ছবি। আর একখানা ইলেকট্রন ওই নীল বিন্দুগুলির মধ্যে সবকয়টিতেই থাকতে পারে; আর যেহেতু সে ওইরকম অকল্পনীয় গতিতে ঘুরছে, আপনি যে বিন্দুতেই পৌঁছন না কেন, আপনার আগেই ইলেকট্রন সেখানে হাজির হয়ে যাবে !

ফলে ? ফলে আপনি যদি একটু দূর থেকে দেখেন, তাহলে মনে হবে একটাই ইলেকট্রন একই সময়ে সবকটা বিন্দুতে হাজির আছে, আর গোটাটা মিলে একটা মার্বেলগুলির মতো আকার নিচ্ছে।

যেমন তিন ব্লেডের ফ্যান দ্রুতগতির জন্য চাকতির মতো দেখতে লাগে, সেইরকমই একটাই ইলেকট্রন মুখে রক্ত তুলে ছোটাছুটি করে একটা মার্বেল গড়ে তোলে।

ওই মার্বেলের ভেতর ঢুকতে গেলে কি করতে হবে ? ভেতরে তো পুরোটাই ফাঁকা, কি মজা - আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে থাকা যাবে !!

এ আর কি কঠিন কাজ, ইলেকট্রনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে টুক করে সীমানা পেরিয়ে ঢুকে পড়লেই হল!

ওইখানেই যতো গন্ডগোল - পরমাণুর বর্ডারে যে কোনো বিন্দুতেই যাই না কেন, দেখতে পাবো ইলেকট্রন দাঁড়িয়ে - তাকে ধাক্কা মেরে না সরিয়ে ভেতরে ঢোকাই যাবে না।

সবমিলিয়ে ব্যাপার কি দাঁড়ালো ? বেশ খানিক ফাঁকা জায়গা, আর এক ব্যাটা ইলেকট্রন এসে সেই জায়গা ঘিরে এমন বাঁইবাঁই করে ঘুরতে আরম্ভ করেছে, যে একই সময়ে সবজায়গায় হাজির হয়ে যাচ্ছে, কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না -

সীমান্তে একদম ফুলপ্রুফ পাহারা ! দূর থেকে ওটাকেই তখন মার্বেলের গুলির মতো দেখতে লাগছে।

এইরকম মার্বেলের গুলি গায়ে গায়ে লেগেই কঠিন, তরল, গ্যাস এইরকম নানারকমের জগৎ তৈরী হয় বলে মনে হয়। এই বলে মনে হয় - এটা ইচ্ছে করেই লিখলাম, কারণ মনে হওয়া-টাই জগতের সবচেয়ে বড়ো রহস্য !!
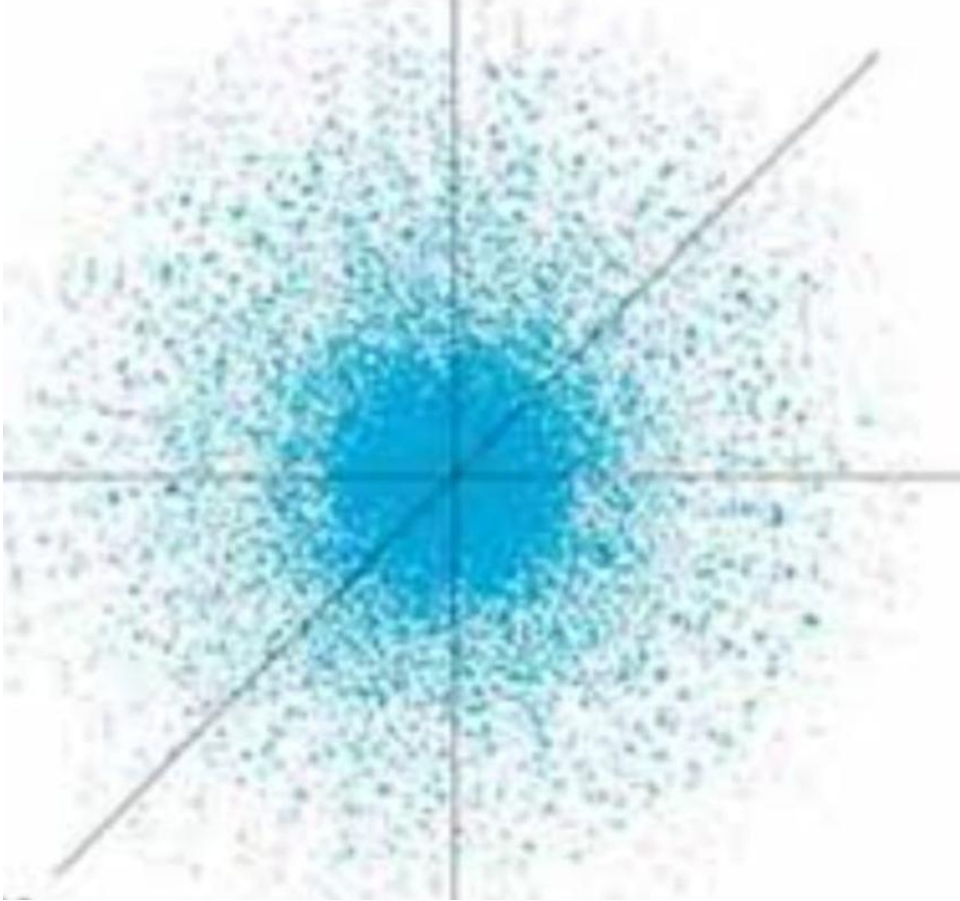
একটা ইলেকট্রন আসলে এইরকম বলে মনে হয়